"মানব উন্নয়ন, সামাজিক পুঁজি ও পরিবেশ" কর্ম অধিবেশনে প্রদত্ত
মাযহারুল হক স্মারক বক্তৃতা

সামাজিক পুঁজি, মানব উন্নয়ন ও পরিবেশ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আতিউর রহমান

Indeed, individual agency is, ultimately, central to addressing these deprivations. On the other hand, the freedom of agency that we individually have is inescapably qualified and constrained by the social, political and economic opportunities that are available to us. There is a deep complementarity between individual agency and social arrangements.

— Amartya Sen

Development as Freedom, Alfred A. Knopf, New York, 1999, p. xi-xii

'আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ', রবীন্দ্র-রচনাবলী
দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.. ৬২৭

১. *ভূমিকা: উন্নয়নের সংকট*

প্রচলিত উন্নয়ন ধারণাটি হালে খানিকটা সংকটেই পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। গত শতকের আশির দশকের শেষ প্রান্তে বার্লিন দেয়ালের পতনের পর যারা বাজার অর্থনীতি এবং উদার গণতন্ত্রের 'প্রশ্নাতীত' বিজয় বলে আত্মতৃপ্তিতে ভুগছিলেন তাদের অনেককেই এখন বেশ সংশয়ের মধ্যে পড়তে দেখা যায়। তাদের এই সংশয়ের পেছনে প্রধান যে তিনটি কারণ কাজ করছে বলে মনে হয় সেগুলো হচ্ছে:[১]

ক. রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা দুইই হারাতে বসেছে।

---

* সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস, ঢাকা। বক্তা প্রবন্ধটি তৈরির কাজে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিআইডিএস-এর গবেষণা কর্মকর্তা মাহফুজ কবীরের কাছে কৃতজ্ঞ।

[১] UNDP; *Sustainable Human Development: From Concept to Operation — A Guide for the Practitioner*; New York, 1994, P.6

খ. সর্বক্ষণ অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, ব্যক্তিখাতের প্রতি নিরঙ্কুশ আস্থা, 'getting the prices right' নীতিকে অন্য সকল নীতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবার কারণে বাজার জনমনে নানা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে। তারও গ্রহণযোগ্যতা এখনও নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত।

গ. বিজ্ঞানও বহুমত, বহুপথের বদলে একরৈখিক ভাবনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দিন দিন জনসম্পৃক্তি হারাচ্ছে। স্থানীয় জ্ঞান, ঐতিহ্য, সৃজনশীলতা উপেক্ষিত বলে প্রচলিত বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও গভীর সংশয় দেখা দিয়েছে।

প্রধানত: এই তিন ধারার সংকটের কারণে প্রচলিত উন্নয়ন ধারণাকে ঘিরে বিশেষ করে পূবদেশীয় সমাজে সংশয় গভীরতর হচ্ছে। পশ্চিমের নাগরিক সমাজেও একপেশে উন্নয়ন কৌশলকে ঘিরে সংশয় দানা বাঁধছে। একরৈখিক বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সিয়াটলসহ নানা স্থানে জনসমাবেশ ও প্রতিরোধের মাত্রা দেখেই এমন ধারণা করা হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নয়া ধারার উন্নয়ন ভাবনার ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। নয়া ভাবনায় জৈবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক 'diversity' বা বহুকরণ গুরুত্ব পাচ্ছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উন্নয়নের বাঁধা না ভেবে সহায়ক সম্পদ হিসেবে স্বীকার করার প্রবণতাও বাড়ছে। আর এভাবেই উন্নয়নে সামাজিক পুঁজির[২] (মুখ্যত: স্বেচ্ছাধমী সামাজিক বিধি-বিধান) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রাপ্তির খানিকটা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে ভাগ করে নেবে, বর্তমানের সুযোগ সুবিধা ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্যে খানিকটা সঞ্চিত রাখবে, একা একা সবকিছু না করে সবাই মিলে কিছু করার সম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং ব্যক্তি ও সম্মিলনের সম্পূরক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার নয়া পথ খুঁজে নেবে — এ সবই সামাজিক পুঁজির বিকাশের পক্ষের যুক্তি। কাঙ্ক্ষিত নয়া এই বাস্তবতায় মানুষের সক্ষমতা বাড়বে। বাড়বে স্বাধীনতা, মানবিকতা ও সহমর্মিতা। তৈরি হবে সৃজনশীলতার এক উর্বর ভূমি। আর এমন সৃজনশীলতার ভূমি পরিকল্পনা করে তৈরি করা সম্ভব নয়। ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজকে উদ্যমী ও সৃজনশীল করার চেষ্টা করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সামনে রেখে সামাজিক নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জনগণের পছন্দ মতো একটি উন্নয়ন কৌশল তৈরি করার কাজে আমাদের সার্বিক অংশগ্রহণ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম। সামাজিক পুঁজির সর্ব্বোচ্চ বিকাশ আমরা ১৯৭১ সনে দেখেছি। মানুষ যে মানুষেরই জন্যে এই কথাটি আমরা একাত্তরে গভীর দুঃখ ও আনন্দের অভিজ্ঞতায় শিখেছি। সর্বব্যাপী আত্মীয়তার সামাজিক বন্ধনের এমন হিরন্ময় সময় আর কোনো দিন আমাদের জীবনে আসবে কিনা সে কথা এখনও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। আমরা সবাই মিলে বিপুল সম্ভাবনাময় একটি দেশ গড়ার স্বপ্ন বুনেছিলাম একাত্তরে সেই দিনগুলোতে। দেখতে দেখতে বাংলাদেশের বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে। নতুন মিলেনিয়ামের শুরুতে আমাদের যেমন হিসেব করার দরকার আমরা কী পেয়েছি, কী পাইনি, আমাদের দায়িত্ব কতটা পালন করেছি, কতটা করা হয়নি, তেমনিভাবে বিচার করা দরকার এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের জন্য একটা সম্মানজনক স্থান করে নেবার জন্য কী কী দরকার এবং আমাদের কী রয়েছে। আমাদের জানা দরকার আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর কোথায় যেতে চাই। আমাদের আছে একখন্ড উর্বর শ্যামল ভূমি যাতে সোনা ফলে। সাহারা মরুভূমির পাশে গিয়ে দাঁড়ালে বোঝা যায় আমাদের কি আছে। আছে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্যে এক সাথে লড়ে যাবার তীব্র সতেজ মন, অভিজ্ঞতা। রয়েছে বিপদে আপদে, জাতীয় দুর্যোগে সবাই

[২] সামাজিক পুঁজির সংজ্ঞা ও প্রয়োগ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলাপ করবো।

মিলে কাজ করে যাবার একান্ত ইচ্ছা। আছে গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে লড়ে যাবার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। তবুও আমাদের স্থান কেনো মানব উন্নয়ন সূচকের অসম্মানজনক পর্যায়ে, নিচের সারিতে? আর কেনোই আমাদের দেশের অবস্থান দুর্নীতির বিচারে শীর্ষে? কেনো আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবন যাপন করে৩ বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণের জন্য প্রতিদিন এমন সংগ্রাম করে?[৩] পাশাপাশি মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেমন করে এতো সম্পদ জড়ো হচ্ছে? সমৃদ্ধি ও নিঃস্বায়নের এই বৈপরীত্য কেনো দিন দিন প্রকট হচ্ছে? আমরা কেনো আমাদের সবুজ প্রকৃতি সজীব বাতাস কিংবা শংকামুক্ত ও সহমর্মী সামাজিক পরিবেশকে ধরে রাখতে পারছি না? নিজেদেরকে গৌরবোজ্জ্বল অতীত, কৃষকদের বারবার বাম্পার ফলন উপহার, তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যম কাজে লাগিয়ে সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনকে উজ্জীবিত করার মধ্য দিয়ে মানবিক ও পরিবেশ সহায়ক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার সময় কিন্তু বয়ে যাচ্ছে।

২. *সামাজিক পুঁজিঃ মানুষ মানুষের জন্য*

'যে কোনো উপলক্ষে হউক অনেক লোকের চিত্ত এক হইতে পারিলে তাহাতে মহৎ ফল ফলে। যে জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সেই এক হইবার শক্তি স্বভাবতই কাজ করে, তাহাদের মধ্য হইতেই কোনো-না-কোনো প্রকার মহত্ত্ব অঙ্গধারণ করিয়া দেখা দেয়, তাহারাই সভ্যতাকে জন্ম দেয়, সভ্যতাকে পোষণ করে। বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ।'

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মশক্তি', রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খন্ড, পৃ.. ৬২২

শত বছর আগে মানুষে মানুষে ঐক্যের শক্তি বা সামাজিক পুঁজি থেকে যে মহৎ ফল বা উন্নয়ন সম্ভব তা ঠিকই বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন, গণতন্ত্র, সুশাসন বা পরিবেশ রক্ষার মত জরুরি আর্থ-সামাজিক বিষয়ে পারস্পরিক বিশ্বাস, সমঝোতা ও নেটওয়ার্কিং- এর মাধ্যমে সমাজের মানুষে মানুষে মধ্যকার একাত্মতার যে কোনো বিকল্প নেই তা সমকালীন বিশ্বের তাত্ত্বিকেরা প্রায় এক বাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছেন। বিশেষ করে বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতার প্রকট অভাব যে তাদের অনুন্নয়নের জন্য বহুলাংশে দায়ী কিংবা উন্নতির পথে প্রধান বাধা তা উল্লেখ করেছেন তাঁরা।[৪] সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায় পারস্পরিক সুসম্পর্ক, মূল্যবোধ ও আদর্শের বাঁধনে গড়া নৈতিক সম্পদ[৫] বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেসহ পৃথিবীর উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য ও দুর্নীতির মত ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে উন্নয়নের আলোকিত সোপানে পা রাখতে পারে।

---

[৩] Toufique, K.A. and C. Turton (2002:15); *Hands Not Land: How Livelihoods Are Changing in Rural Bangladesh*; BIDS & DFID.

[৪] ..... much of the economic backwardness in the world can be explained by the lack of mutual confidence. – Arrow, K.J. (1972: 357), *Gifts and Exchanges*; Philosophy and Public Affairs 1.

[৫] Most forms of social capital, such as trust, are what Albert Hirschman has called "moral resources" — that is, the resources whose supply increases rather than decreases through use and which become depleted if not used. — Putnam, R.D. and others (1993: 169), *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*; Princeton University Press.

সামাজিক পুঁজির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন রবার্ট পুটনাম । তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক পুঁজি হচ্ছে সমাজের বাসিন্দাদের আনুভূমিক (horizontal) সম্পৃক্ততায় সৃষ্ট সংগঠনসমূহ যা ঐ সমাজের উৎপাদনশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে । এই সব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে নাগরিক অংশগ্রহণে তৈরি নেটওয়ার্ক ও সামাজিক আদর্শ । এই ধারণার দুটো অনুমিতি রয়েছে —এক. ঐ নেটওয়ার্ক ও আদর্শগুলো প্রায়োগিকভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং দুই. এদের অর্থনৈতিক প্রভাব গুরুত্ববহ । এই সংজ্ঞায় সামাজিক পুঁজির মূল বৈশিষ্ট্য হল এটা জনসংগঠনের সদস্যদের পারস্পরিক লাভের জন্য সমন্বয় ও সহযোগিতাকে সহজ করে তোলে ।[৬]

জেমস কোলম্যান সামাজিক পুঁজিকে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে সংজ্ঞায়িত করেছেন । আনুভূমিক সংগঠনের পাশাপাশি তিনি উলম্ব (vertical) সংগঠনকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর সামাজিক পুঁজির সংজ্ঞায় ।[৭] তাঁর মতে, সামাজিক পুঁজিকে এর ক্রিয়াপদ্ধতিই সংজ্ঞায়িত করে । এটা কোনো একক সত্ত্বা নয় বরং বিভিন্ন সত্ত্বার বৈচিত্র্যের স্বরূপ যাতে দুটো সাধারণ উপকরণ রয়েছে: তাদের সবার মধ্যেই সামাজিক কাঠামোর কোনো না কোনো রূপ রয়েছে, এবং তারা ঐ কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডকে সহজ করে তোলে । অন্যান্য পুঁজির মতোই সামাজিক পুঁজি উৎপাদনশীল । এটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাঁনো সম্ভব করে তোলে যা এর অনুপস্থিতিতে সম্ভব হতো না ।[৮]

দৃষ্টিভঙ্গিকে আরেকটু সম্প্রসারিত করলে সামাজিক পুঁজির মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ অন্ত র্ভূক্ত হয় । এই অন্তর্ভুক্তি সমাজকে তার আদর্শের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম করে এবং সমাজকাঠামোর মানবিক রূপ দেয় । অনানুষ্ঠানিক আনুভূমিক সম্পর্ক এবং ক্রমপ্রাধ্যান্যভিত্তিক উলম্ব বা খাড়াখাড়ি সংগঠনসমূহের পাশাপাশি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক পুঁজির মধ্যে রয়েছে আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ও কাঠামো, যেমন সরকার, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা, আইনের শাসন, আদালত ব্যবস্থা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ।[৯]

সামাজিক পুঁজির একটি অত্যাবশ্যক উপাদান হচ্ছে পারস্পরিক আস্থা । সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো আস্থার উত্তরণ ঘটায় এবং তাকে ছড়িয়ে দেয় গণমানুষের মধ্যে ।[১০] আবার বিশ্বাস ও আস্থা সামাজিক সহযোগিতাকে উদ্দীপ্ত ও সম্প্রসারিত করে । একটি জনসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস যতো বাড়ে, সহযোগিতার সম্ভাবনাও ততই যোগ হয় । অন্যদিকে সহযোগিতা নিজেও বিশ্বাস এবং আস্থার জন্ম দেয় ।[১১] আবার সামাজিক পুঁজি স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতাকে সহজ করে তোলে[১২] । কেননা পারস্পরিক অবস্থার মাধ্যমে সমাজের মানুষগুলো পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে, সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়,

---

[৬] Serageldin, I. and C. Grootaert (2000:45-6); *Defining social capital: an integrating view*; in: Social Capital: A Multifaceted Perspective, P. Dasgupta and I. Serageldin (ed.), World Bank.

[৭] ঐ, p. 46.

[৮] Coleman, J.S. (2000:16); *Social capital in the creation of human capital*; World Bank, op. cit., p. 16.

[৯] Serageldin, I. and C. Grootaert, op. cit., p. 46.

[১০] আস্থার বিস্তার সম্পর্কে পুটনাম বলছেন: I trust you because I trust her and she assures me that she trusts you.; Putnam, R.D., op. cit., p. 169.

[১১] ঐ, p. 171.

[১২] ঐ, p. 167.

তাদের মধ্যেকার ফারাক কমে যায় এবং পরস্পর আপন হয়ে ওঠে। অন্য কথায়, ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সামাজিক পুঁজির মজুত ও ক্রিয়াশীলতা বাড়ে। পারস্পরিক সহায়তার অনুশীলন সামাজিক পুঁজিতে বিনিয়োগ নির্দেশ করে।[১৩] তাই বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষণায় পারস্পরিক আস্থাকে অর্থনৈতিক উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সামাজিক নেটওয়ার্ককেও সামাজিক পুঁজির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।[১৪]

আস্থা, আদর্শ ও নেটওয়ার্কের মতোই সামাজিক পুঁজির একটি বিশেষ চরিত্র হচ্ছে এটা একটা গণদ্রব্য (Public good) যা গতানুগতিক পুঁজির মতো ব্যক্তিগত দ্রব্য (private good) নয়। অন্যদিকে সামাজিক পুঁজি প্রায়শ:ই অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডের উপজাত (by-product) হিসেবে উৎপন্ন হয়।[১৫]

সামাজিক পুঁজির দুটো রূপ রয়েছে : প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি, যার ভিত্তি হচ্ছে লেনদেন, এবং সম্পর্কগত পুঁজি যার ভিত্তি বিবিধ সামাজিক সম্পর্ক। নিচের ছকে তা দেখানো যায়।

ছক ১: সামাজিক পুঁজির রূপ[১৬]

সামষ্টিক পদক্ষেপের ভিত্তি	প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি দেনদেন	সম্পর্কগত পুঁজি সম্পর্ক
প্রণোদনার উৎস	ভূমিকা কার্যপ্রণালী অনুমোদন	বিশ্বাস মূল্যবোধ আদর্শ
প্রণোদনার ধরণ উদাহরণ	সর্বোচ্চকরণের আচরণ বাজার, আইন কাঠামো	যথাযথ আচরণ পরিবার, নৃগোষ্ঠী, ধর্ম

সূত্র: Berman, S. (1997).

এই দু'ধরনের সামাজিক পুঁজি চারটি বিন্যাসে উপস্থিত থাকতে পারে।

এক. শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ও সম্পর্কগত পুঁজি। এ বিন্যাস উচ্চ সামাজিক পুঁজি নির্দেশ করে। এ অবস্থায় কর্মকান্ড সম্প্রসারণে ব্রতী হওয়া যায়।

দুই. শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ও দুর্বল সম্পর্কগত পুঁজি। এ বিন্যাস শক্তিশালী সংগঠনসমূহের উপস্থিতি নির্দেশ করে। এ অবস্থায় কর্মকান্ড আইনসম্মত ও নিবিড় করতে হবে।

তিন. দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ও শক্তিশালী সম্পর্কগত পুঁজি। এ বিন্যাস সমাজে গতানুগতিক সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এ অবস্থায় সামাজিক পুঁজির কাজ হবে নিয়মকানুন চালু করতে এবং দক্ষতা বাড়াতে উদ্যোগী হওয়া।

---

[১৩] ঐ, p. 169.

[১৪] Khan, M.I.A. (2000: 119); *Struggling for Survival: Networks and Relationships in a Bangladesh Slum*; University of Bath, Unpublished.

[১৫] Putnam, R.D. and others, op. cit., p. 170.

[১৬] Krishna, A. (2000:79); *Creating and harnessing social capital*; World Bank, op. cit. p. 79.

চার. দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ও সম্পর্কগত পুঁজি। এটা সামাজিক পুঁজির একটি অস্বাভাবিক ও অনৈতিক বিন্যাস, যা একই সঙ্গে অপ্রত্যাশিতও বটে। এ অবস্থায় সামাজিক পুঁজির কাজ হবে কাঠামো ও আদর্শের উন্নয়নে সহযোগিতা করা।[১৭]

এখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সামাজিক পুঁজি কীভাবে অবদান রাখতে পারে তা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো যায়।

পূর্ব এশিয়া: প্রচলিত উপাদানসমূহ যেমন মানবিক ও বৈষয়িক পুঁজি এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ পূর্ব এশিয়ার বিস্ময়কর অর্থনীতিগুলোতে (miracle economies) বিরাজমান উচ্চ প্রবৃদ্ধির হারকে সামান্যই ব্যাখ্যা করতে পারে। বরং ঐ দেশগুলোর সরকার এমন কিছু নীতি গ্রহণ করে সামাজিক পুঁজিতে বিনিয়োগ করেছে যা ঐ প্রবৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও সাংগঠনিক বিন্যাস যা দক্ষতা বাড়ায়, তথ্যের বিনিময়কে সহজ করে এবং সরকার ও শিল্পের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ায় তা এই পরিবেশকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। আর এসবের সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করেছে ভালোমানের সার্বজনীন শিক্ষা এবং প্রযুক্তি প্রীতি।

ইতালি: ইতালির একটি গবেষণায় পুটনাম ও অন্যান্যেরা (১৯৯৩) যুক্তি দিয়েছেন যে উত্তর ইতালিতে প্রচুর স্বেচ্ছামূলক জনসংগঠন ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সাফল্যের কারণ। সংগঠনগুলো ঐ অঞ্চলকে সামাজিক পুঁজির যোগান দিয়ে সহায়তা করে। কিন্তু দক্ষিণ ইতালিতে সংগঠনের উপস্থিতি কম বলে অর্থনৈতিক সাফল্যও কম।

ভারত: ভারতের মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটসহ অনেক রাষ্ট্রের বন ব্যবস্থাপনা নিয়ে স্থানীয় জনগণের সংগে সরকারি কর্মচারিদের মধ্যকার ভয়াবহ সংঘর্ষ অর্থনীতিতে নিশ্চল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যখন সম্প্রদায়গুলো একত্রিত হল এবং যৌথ বন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হল তখন সংঘর্ষ কমে গেল। জমির উৎপাদনশীলতা ও গ্রামীণ আয় বেড়ে গেল। এক্ষেত্রে সামাজিক পুঁজিতে বিনিয়োগ ছিল স্থানীয় সরকার ও জনসম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টার ফল।[১৮]

বাংলাদেশ: ঊনিশশ' আটানব্বই সালে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হয় তাতে অন্তত: দু'মাসের জন্য থমকে গিয়েছিলো বাংলাদেশের অর্থনীতি। নিশ্চল হয়ে উঠেছিলো মানুষের জীবনযাত্রা। সেসময় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে যায় অসংখ্য সামাজিক ও স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের ত্রাণকাজে অংশগ্রহণের কারণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ঢাকার রাস্তায় নেমেছে, গান গেয়ে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক পুঁজির এই স্বত:স্ফুর্ত উদ্দীপনা সে সময়কালের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক রেখেছে।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সামাজিক পুঁজির রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়, তা স্বতন্ত্র রূপে জেগে ওঠে এবং আলাদা আলাদা সত্তা নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও মানব কল্যাণে অবদান রাখে, মানুষ ও পরিবেশ সহায়ক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

---

[১৭] H, p. 79.

[১৮] Serageldin, I. and C. Grootaert, op. cit., p. 44-5.

এ প্রেক্ষিতে আমরা সামাজিক পুঁজির কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে পারি।

- সামাজিক পুঁজি নানারকম নেটওয়ার্ক ও চুক্তির সাপেক্ষে সেই সম্পর্কসমূহের ওপর আলোকপাত করে যেগুলো সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উভয় দিক থেকেই কার্যকর ও দক্ষ পদক্ষেপকে উৎসাহিত করে। সামাজিক পুঁজি সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে উন্নত রূপ দেয় এবং তাদেরকে দক্ষভাবে পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে।
- সামাজিক পুঁজি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যা অন্যান্য সম্পদ লাভে সহায়তা করে।
- একে এমন সব উপায়ে অর্জন করা যায় যেগুলোকে সৃষ্টি ও শক্তিশালী করা সম্ভব।
- সামাজিক পুঁজির মধ্যে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত উভয় ধরনের সামাজিক সম্পর্কই রয়েছে। এর একটি গণদ্রব্যের রূপও বিদ্যমান।
- সামাজিক পুঁজির অনুমিতি হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কগুলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এটা বাজার ও রাষ্ট্রের কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- সামাজিক সম্পর্কগুলোর মধ্য দিয়ে সামাজিক পুঁজির প্রভাব উন্নয়ন, জীবনযাপন ও জীবনের গুণের ওপর ইতিবাচক। কারণ এটা আস্থা ও আদর্শ সৃষ্টি করে যা পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করে এবং সুযোগ-সন্ধানী মনোভাব কমায়।[১৯]
- স্থান, কাল ও পরিস্থিতি ভেদে সামাজিক পুঁজির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়।

২.১ *সামাজিক পুঁজির সূচক*

বৈষয়িক পুঁজি পুরোপুরি পরিমাপযোগ্য, কারণ এটা বস্তুগত রূপে মূর্ত থাকে। মানবিক পুঁজি কম পরিমেয় কারণ এটা ব্যক্তির অন্তর্গত দক্ষতা ও জ্ঞান হিসেবে বিমূর্ত থাকে। আর সামাজিক পুঁজির পরিমাপ আরও কষ্টসাধ্য, কারণ এর অস্তিত্ব সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার সম্পর্কের ভেতর। তবে বৈষয়িক ও মানবিক পুঁজির মতোই সামাজিক পুঁজি উৎপাদনশীল কর্মকান্ডকে সহজসাধ্য করে তোলে।[২০]

সামাজিক পুঁজির সূচক প্রধানত তিনটি: এক. সরকারের ওপর আস্থা, দুই. নাগরিক সহযোগিতা, এবং তিন. সাংগঠনিক কর্মকান্ড।

সরকারের ওপর আস্থাকে পরিমাপ করা হয় চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রশ্ন রেখে: শিক্ষা, আইন কাঠামো, সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ। অন্যদিকে, নাগরিক সংস্কৃতি ও সামষ্টিক আদর্শ যেমন — সামাজিক নীতি, সততা ও পারস্পরিক আস্থা; ব্যক্তিগত ও সামাজিক লক্ষ্যের বিন্যাস; কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা এবং সামাজিক লাভ বন্টনের ধরনের ওপর ভিত্তি করে নাগরিক সহযোগিতাকে পরিমাপ করা হয়।[২১]

---

[১৯] Khan, M.I.A., op. cit., p. 134.

[২০]Coleman, J.S., op. cit., p. 19.

[২১]de Mello, L. (2000:9); *Can Fiscal Decentralization Strengthen Social Capital*; IMF Working Paper 129.

আর নাগরিক সংগঠনের কর্মকান্ডে ব্যয় করা সময়ের ওপর ভিত্তি করে সাংগঠনিক কর্মকান্ডকে পরিমাপ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন, চ্যারিটি ও রাজনৈতিক এবং/ অথবা সামাজিক সংগঠনসমূহ। সংগঠনগুলো হচ্ছে: (১) বয়স্ক, অক্ষম বা বঞ্চিত জনগণের জন্য সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন, (২) ধর্মীয় সংগঠন, (৩) শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, (৪) ট্রেড ইউনিয়ন, (৫) রাজনৈতিক দল, (৬) দারিদ্র্য, বেকারত্ব, গৃহায়ন ও লৈঙ্গিক বৈষম্যের মতো বিষয় নিয়ে কর্মরত সংগঠন, (৭) উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠন, (৮) পরিবেশবাদী সংগঠন, (৯) পেশাজীবী সংগঠন, এবং (১০) যুব সংগঠন (যেমন — স্কাউট, গালস গাইড ইত্যাদি)।[২২]

সামাজিক পুঁজির কয়েকটি বিকল্প সূচকও রয়েছে :

- বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা
- আইনের শাসন এবং
- লৈঙ্গিক ক্ষমতায়ন এর আবার দুটো সূচক রয়েছে: সংসদে নারী এবং সরকারে নারী । এ দুটো সূচক তৈরি করেছে ইউএনডিপি। দ্বিতীয় সূচকে সরকারি পদে নারীর অবস্থান নির্দেশ করা হয় যার মধ্যে সরকার-প্রধান এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর পদও অন্তর্ভুক্ত।[২৩]

২.২ *সামাজিক পুঁজির ব্যবহার*

বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনে ও সার্বিক কল্যাণে সামাজিক পুঁজিকে ব্যবহার করা যায়।

- দল মত নির্বিশেষে সকলে একত্রিত হয়ে একটি কল্যাণকর সমাজ (good society)[২৪] নির্মাণ করা যায়। তবে এজন্য দরকার সমাজে পর্যাপ্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ, পরমত সহিষ্ণুতা (habituation), মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যম। আবার এসব সামাজিক শর্ত অর্জনে দরকার সামাজিক পুঁজি।
- দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি অর্থব্যবস্থা ব্যর্থ হলেও জনসংগঠন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজের দরিদ্র মানুষের সচেতনতা বাড়িয়ে এবং সৃজনশীলতাকে উদ্দীপ্ত করে গণদারিদ্র্যের বোঝা লাঘব করতে পারে সামাজিক পুঁজি।
- দুর্নীতির মতো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাধি নিরাময়ে সামাজিক সংগঠন ও নেটওয়ার্ক এবং সামাজিক প্রতিরোধ (social resistanace) কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।
- বর্তমান যুগ তথ্যের। অর্থনৈতিক এজেন্টগণ যেহেতু প্রায়শ:ই প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে অদক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাই আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে তথ্য সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যর্থতা এড়াতে সহায়তা করতে পারে।

---

[২২] ibid., p. 24.

[২৩] ibid., p. 20.

[২৪] Knight, B. et. al.,(2002:63); *Reviving Democracy: Citizens at the Heart of Governance*; Earthscan, London.

- কর্মকান্ডের সমন্বয়ের অভাবে সুযোগসন্ধানী অর্থনৈতিক এজেন্ট বাজার ব্যর্থতা সৃষ্টি করতে পারে বলে সামাজিক পুঁজি ব্যবহার করে এ ব্যর্থতা দূর করা যায়। বিভিন্ন সেচ প্রকল্পে এরকম ব্যর্থতা দেখা যায়। নানান আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সামাজিক উপায় ব্যবহার করে পানির ন্যায্য বন্টন ও অপচয় রোধ নিশ্চিত করা যায়।
- গণদ্রব্যের সুযোগ ও বাইরের প্রভাবের (externality) ব্যবস্থাপনায় সামষ্টিক সিদ্ধান্ত দরকার হয়। গণদ্রব্যের সুযোগ যাতে কতিপয় ব্যক্তি ভোগ না করে এবং বাজারের তৈরি নেতিবাচক প্রভাবের (negative exteenality) যাতে কাম্য বন্টন ঘটে সেক্ষেত্রে সামাজিক পুঁজি ব্যবহার করা যায়।
- রাজস্ব কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রায়ন সামাজিক পুঁজি বাড়ায়। এই বর্ধিত সামাজিক পুঁজি সরকারকে জনগণের আরো কাছে নিয়ে আসে (de Mello, 2000: 22)। এই পুঁজিকে দারিদ্র্য নিরসন ও উন্নয়ন কৌশলে ব্যবহার করা যায়।
- জনসংগঠনে কার্যকর সম্পৃক্ততা মানবীয় পুঁজির উন্নয়ন ঘটায় বিশেষত: ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে।
- পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতার বিকল্প নেই। আমাদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষা এবং তার লালন ও বিকাশে নেটওয়ার্কিং সবচেয়ে জরুরি।
- প্রাকৃতিক ও জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় সামাজিক পুঁজিকে সহজেই ব্যবহার করা যায়।
- সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সামাজিক পুঁজি অত্যাবশ্যক।

২.৩ *সামাজিক পুঁজির সীমাবদ্ধতা*

সামাজিক পুঁজির প্রধানত: চারটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

- বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সমাজের সকল মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। যেমন - বাংলাদেশের এনজিওগুলো সমবেত কর্মকান্ডকে সহজ করে বহু মানুষকে এর আওতায় এনেছে বটে, তবে অনেক মানুষই এই সামষ্টিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারে না। দারিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম এবং আগামী দিনের দরিদ্র্যেরা এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যায়[২৫]।
- সামাজিক বন্ধন শিথিল হলে ব্যক্তি দায়িত্ব নিয়ে তথ্য সরবরাহ করে না এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সে উদাসীন থাকে। আমিন (১৯৯৩) দেখিয়েছেন যে ঢাকায় শিল্পোদ্যোগ বিকাশের অন্যতম প্রধান বাধা হচ্ছে চাকরিতে আত্মীয়স্বজনকে নিয়োগ করা। এর ফলে দক্ষ জনশক্তি নিয়োজিত হতে পারে না।

[২৫] Rahman, A. and A. Razzaque; *On Reaching the Hardcore Poor: Some Evidence on Social Exclusion in the NGO Programmes*; The Bangladesh Development Studies, March 2000, p. 31.

- সাম্প্রদায়িক সংহতি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। হালে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামষ্টিক অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া হলেও রক্ষণশীল সমাজে তাকে ভালো চোখে দেখা হয় না।
- সামাজিক আদর্শের নিম্নমুখী প্রবণতাকে সামাজিক পুঁজির নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্থ হলে এর প্রভাব সমাজে পড়ে। সামাজিক আদর্শ নিম্নমুখী হয়। ফলে সামাজিক পুঁজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সমাজে সন্ত্রাস এবং নারী ও শিশুর প্রতি অপরাধ ও সহিংসতা বাড়লে, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের মনোভাবের বিস্তার ঘটলে সমাজ বিভক্ত হয়, সমাজের ভেতরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে সামাজিক পুঁজি লোপ পায়। সমাজের আত্মা ভাগ হয়ে যায়।[২৬]

২.৪ বাংলাদেশের সামাজিক পুঁজির সাম্প্রতিক প্রবণতা: 'দুষ্কালের দিবানিশি'

বহুকাল আগে থেকেই বাংলাদেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়া, বিপদে-আপদে পরস্পর পাশাপাশি দাঁড়ানো, সবাই মিলে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা করা কিংবা যে কোনো সামাজিক সমস্যা পরস্পর আলাপ করে সকলের মত নিয়ে সমাধান করা। নদীমেখলা বাংলাদেশ যখন গঙ্গাঋদ্ধি ছিল, জলকাদার ভেতর থেকে উঠে আসা প্রাকৃতজনকে তখন ভয় করতো জ্ঞান-বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করা গ্রীক। যুদ্ধবিদ্যার পৃথিবীর সবচেয়ে পারদর্শী গ্রীক বাহিনী ও মহাবীর আলেকজান্ডার। প্রাকৃতজনদের একতার ভয়ে তারা গঙ্গাঋদ্ধি আক্রমণ করতে সাহস করেনি।[২৭] পরবর্তীতে বিভিন্ন আমলে বাংলা পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট কিংবা সুবর্ণ গ্রামের মতো বারো ভূঁইয়াদের রাজত্ব অর্থাৎ পারতপক্ষে একেকটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে নিজস্ব সত্ত্বা বজায় রেখেছে। একতার শক্তি দিয়ে ক্ষুদ্র সত্ত্বাকে বড়ো বড়ো শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে টিকিয়ে রেখেছে। দেশ ইংরেজদের হাতে চলে যাবার পর প্রাথমিক ও শক্তিশালী বিদ্রোহগুলোও দেখা গেছে এখানেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে চল্লিশের দশকে এদেশের আপামর জনগণ স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশ নিয়েছে একটি গণতান্ত্রিক, শোষণমুক্ত ও মানবিক সমাজ নির্মাণের জন্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথমেই এদেশের মানুষের ওপর আঘাত আসে মাতৃভাষার ওপর। বায়ান্নতে জ্বলে ওঠে বাংলার ছাত্র-জনতা, তবে আটচল্লিশ-বায়ান্ন পর্বে তাদেরকে ভাষার প্রশ্নে জাগিয়ে রেখেছে তমুদ্দুন মজলিশ, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ অনেক গণ সংগঠন। এদের নেটওয়ার্কিং ও কর্মকান্ড গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো সামাজিক আদর্শ তথা সামাজিক পুঁজির উন্মেষ ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। এক বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের ভিত শক্তিশালী করেছে।[২৮] ঊনসত্তরে দেশের মানুষ সামরিক একনায়ক-লৌহমানব আইয়ুব খানের কব্জা থেকে গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য রাজপথে নেমে আসেন। তখন সামাজিক পুঁজির আরো উদ্দীপ্ত রূপে দেখা গিয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারি, আইনজীবী, শিক্ষক সকলেই রাজপথে নেমে এসেছিলেন গণতন্ত্রের জন্য। তবে এদেশের ইতিহাসে সামাজিক পুঁজির সবচেয়ে সুন্দর রূপ দেখা গেছে

---

[২৬] দেখুন, Schism in the Soul. অধ্যায়টি Arnold Toynbee এর A study of History (1962), Oxford University Press, London -এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ খন্ডে রয়েছে।

[২৭] রহমান, মু.হা.; গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ. ১৫-১৬।

[২৮] রহমান, আ. ও লে. আজাদ; ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি; ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৩৬।

একাত্তরে। তখন বাংলাদেশ সামাজিক পুঁজির এক উর্বর ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। সারা দেশ জুড়ে আত্মীয়তার বন্ধন এসব সুদৃঢ় হয়েছে যে মুক্তিযোদ্ধারা খুব সহজেই যে কোনো বাড়িকেই নিজের বাড়ি ভাবতে পারতেন, যে কোনো মাকে বা বোনকে নিজের মা বা বোন ভাবতে পারতেন।[২৯] এই সামাজিক পুঁজির ঘনিভূত প্রকাশের কারণেই দ্রুত আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে পেরেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর আমরা আমাদের এই বিপুল সামাজিক পুঁজিকে ধরে রাখতে পারিনি। সুন্দর একটি সংবিধান, চমৎকার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেও গণতন্ত্র, উন্নয়ন, শোষণমুক্ত ও মানবিক সমাজ নির্মাণ এবং দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য আমরা আমাদের সৃজনশীল সম্মিলিত উদ্যোগকে সফলভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। দেশের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদেরকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেবার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল বটে,[৩০] কিন্তু তা আর পরে সেইভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তবে সেই সময়ের বৈরি বিশ্ব পরিস্থিতি, বিপর্যস্ত অবকাঠামো, অতি উঁচু প্রত্যাশা নির্ভর ছটফটে তারুণ্য এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির অশুভ তৎপরতা, প্রশাসনের অদক্ষতার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাসমূহের কথাও মনে রাখা ভালো। একইভাবে পরবর্তীতে খালকাটা কর্মসূচি দেশের গ্রামীণ জনগণের মধ্যে প্রথমদিকের উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত তার অপমৃত্যুই ঘটেছে। উলসী যদুনাথপুর প্রকল্পটি তার বড় সাক্ষী। এরপর সামাজিক পুঁজির একটি অভূতপূর্ব সমাবেশ দেখা যায় আটাশির বন্যার সময়। তখন মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে রুটি বানানোর ধুম পড়েছিল, শিক্ষাঙ্গনে ছেলেমেয়েরা রুটি ও স্যালাইন তৈরির কাজে সম্পৃক্ত হয়েছিল। বন্যা মোকাবিলায় নিবেদিত ছিল বহু পেশাজীবী, স্বেচ্ছাসেবী, এনজিও, ব্যবসায়ী ও সামাজিক সংগঠন।[৩১] নব্বইয়ের স্বৈরাচার-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে রাজপথ পরিণত হয় ছাত্র, জনতা, রাজনীতিবিদ এবং পেশাজীবী ও গণসংগঠনের মিলনমেলায়। বাংলাদেশের সামাজিক পুঁজি তার স্বভাবসুলভ রূপ নিয়ে জেগে ওঠে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায়। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে তিন জোটের সমঝোতা স্মারকে। সেই চেতনায় প্রতিফলন ঘটে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে। ফিরে আসে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা। তা সত্ত্বে দেশে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া গভীরতর হয়নি। নির্বাচনের দিন ছাড়া প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের গণতন্ত্রের স্বাদ পাবার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। আটানব্বইয়ের ভয়াবহ বন্যার সময়ও আটাশির মত রূপ গ্রহণ করে সামাজিক পুঁজি। দুর্যোগের এই দুঃসময়ে আবার সামাজিক পুঁজির ঘনিভূত রূপ আমরা দেখতে পাই। দুর্যোগ কেটে যাবার পর আবার তা ফিকে হয়ে আসে।

কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সামাজিক পুঁজির একটি উদ্বেগজনক নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ সন্ত্রাসের আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে। ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণসহ নারীর প্রতি বিবিধ সহিংসতার মাত্রা বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক হারে। শিশুর প্রতি অপরাধের গতিও বেড়েছে সমান তালে। সারাদেশের অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের নিয়ে আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অন্যদিকে শিশুদের মনোজগতে ভয় প্রতিনিয়ত হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে বলে দেশের ভবিষ্যত সামাজিক পুঁজি (future social capital) ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। নিচের তালিকায়

[২৯] রহমান, আ.; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: আর্থ-সামাজিক পটভূমি; প্রকাশিতব্য।

[৩০] *The Fifth Five Year Plan: 1973-78*; Planning Commission, GoB, Dacca, Nov. 1973, chap. 4.

[৩১] রহমান, আ.; চলমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নাগরিক সমাজ; ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২৫ আগষ্ট ১৯৯৮ ।

[৩২] শিশুর প্রতি অপরাধ বাড়ছেই; সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০২।

গত এক বছরে শিশুর প্রতি সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[৩২]

তালিকা ১: শিশুর প্রতি অপরাধ

সন	২০০১							২০০২					২০০১-০২
ধরণ	সে:	অক্টো:	নভে:	ডিসে:	জানু:	ফেব্রু:	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	মোট
হত্যা	২৭	৩৬	৫২	৪৭	৫৫	৩৪	৫৭	৫৩	৩৯	৪৯	৫৯	৫৬	৫৭৮
অপহরণ	২৬	১৮	২৭	৩১	৪৪	২৯	৫২	৯৫	৪২	৪১	৩১	৪৯	৪৮৬
ধর্ষণ	২১	৩৮	২২	২৭	৩৮	৩৬	৯৪	৭৩	৪৭	৮৪	৩৮	৪৭	৫৬৫
হারিয়েছে	২৮	৪০	২৮	৩৮	৬৫	৬১	৯৭	১০০	৬৩	৭৭	১০৩	৭১	৭৭১

সূত্র: বাংলাদেশে শিশু অধিকার ফোরাম, (২০০২)।

লক্ষনীয়, প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রেই গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের পরিসংখ্যানটির চেয়ে এ বছরের আগষ্ট মাসের অংকটি প্রায় ক্ষেত্রেই দ্বিগুণ কিংবা তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। পাশাপাশি নারীর ওপর আক্রমণের মাত্রা যে কোনো সময়ের চেয়ে বেড়ে গেছে। মহিলা পরিষদের বিন্যস্ত তথ্য ছাড়াও প্রতিদিনের সংবাদপত্র এই দুঃখজনক প্রবণতা সমর্থন করছে। হালের ব্যবসা বানিজ্য ও শিল্পায়নও চাঁদাবাজির নির্মম শিকার। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সংগঠনসমূহ এমন দাবি করছে।

সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে প্রণীত PRSP দলীলে দাবি করা হয়েছে যে দেশে মাস্তানতন্ত্র (mastanocracy) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩৩] সন্ত্রাসীরা একটি সার্বভৌম নেতিবাচক সামাজিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে সন্ত্রাসই যেন এসময়ের সবচেয়ে সফল শিল্প। মানবাধিকারের পরিস্থিতিও তাই নাজুক। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধে ভাংগন ধরেছে। নাগরিক অধিকারগুলোকে লংঘণ করা হচ্ছে। শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে, রাজনীতিতে সহনশীলতা নেই বল্লে চলে।[৩৪] প্রতিপক্ষকে ঘায়েলই রাজনৈতিক মোকাবিলার উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিহিংসাই যেন রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল কথা এখন। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দুর্নীতি এত বেশি বিস্তৃত ও গভীর হয়ে পড়েছে যে সামাজিক আদর্শের নিম্মুখী প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে। আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নেতিবাচক। মোট কথা, দেশের মানুষ আজ হতাশা ও অন্ধকারের মুখোমুখি।[৩৫] বাংলাদেশের হৃদয় ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাচ্ছে। সমাজের আত্মার ভাঙন রোধের জন্য তাই ঐক্যের শক্তি এখন অতি জরুরি। যে কোনোভাবে সামাজিক পুঁজির পুনরুত্থান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্রকে গভীরতর

[৩৩] I-PRSP বলছে: The growing violence against women, both in rural and urban areas, has been identified as a major concern as well as the emergence of *mastanocracy* (local terrorism) imposing considerable "transaction cast" on normal economic activity; *Bangladesh: A National Strategy for Economic Growth and Poverty Reduction (Draft)*; MoF, GoB, April 2002, p. 15.

[৩৪] I-PRSP আরো বলছে: Law and order has been identified as a critical concern. This has been attributed to weakening of governance, criminalization of politics, corruption, violation of citizen rights, break-down of traditional moral order, and intolerant political culture; p.15.

[৩৫] ..... the nature of breakdowns of civilizations can be summed up in the three points: a failure of creative power in the minority, an answering withdrawal of mimes on the part of the majority, and a consequent loss of social unity in the society as a whole. – Toynbee, A.J. (1962:6), Vol 4.

করার জন্যে তা খুবই জরুরি বলে মনে হচ্ছে।

৩. *মানব উন্নয়ন: চাই মানুষের জন্য উন্নয়ন*

শুধু যে জাতীয় আয়ের পরিধি ও প্রবৃদ্ধি কিংবা মাথাপিছু আয় মানুষের কপালে উন্নয়ন ঘটানোর নির্দেশ করে না তা হালের অর্থনীতিবিদগণ ভালোভাবেই টের পাচ্ছেন। তাই তারা উন্নয়নকে মানবমুখী করতে এর সুচকগুলো বদলে ফেলছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান কিংবা সামাজিক ন্যায় বিচারের মতো বিষয়কে তারা উন্নয়নের সূচক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করছেন। মানব দারিদ্র্য হ্রাসকে উন্নয়নের দিকে যাত্রা হিসেবে নির্দেশ করা হচ্ছে। উন্নয়নের এ নুতন ধারণায় মানব উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলো হচ্ছে আত্মমর্যাদাবোধ, নৈতিকতা, স্বাধীনতা, সাম্য, পরিবেশ সচেতনতা, পারস্পরিক আস্থাবোধ ইত্যাদির মতো পরস্পরসংযুক্ত বিষয়গুলো। এসব আর্থ-সামাজিক বিষয় অর্জন করার জন্য মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি তথা সৃজনশীলতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বাজার অর্থনীতির দ্রব্য, অর্থ ও শ্রম বাজারই উন্নয়ন সমস্যার সমাধান দেবে যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে (mechanically and automatically) – এরকম প্রতিষ্ঠিত ধারণার প্রতি দ্বি-মত পোষণ করছেন অনেক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ। অমর্ত্য সেন, মাহবুবুল হক, আনিসুর রহমান এঁদের দলে। এঁদের বাইরেও আরো অনেকে রয়েছেন।

গতানুগতিক উন্নয়ন ভাবনায় বহুমত, সাধারণের প্রজ্ঞা, লৌকিক জ্ঞান ও পুনর্ভাবনার সুযোগ খুব কম। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা সরলরৈখিক ও নিপুন নয় বলে উন্নয়নকে হতে হয় বহুমাত্রিক, জটিল ও মানবস্পর্শী। এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরে জাতিসংঘ দাবি করেছে যে প্রচলিত উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে আরো প্রশ্ন তোলা হোক এবং নিচের কয়েকটি বিষয় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হোক।

- প্রকৃতি ও সমাজের বহুমুখী প্রবণতা;
- ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও অর্জন;
- সমাজের মানুষের হৃদয়ের গভীরতম প্রকোষ্ঠের মানবিকতা, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা;
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ বান্ধব উন্নয়ন;
- মানুষে মানুষে আন্ত:সংযোগ;
- সুশাসন ও সমতা।[৩৬]

উল্লেখ্য এ বিষয়গুলো মানব উন্নয়নের শর্ত ও বটে। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন গবেষণায় তাই এ বিষয়গুলোর ওপর জোর দেয়া চাই।

বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে এদেশের মানব দারিদ্র্য উত্তরণমুখী। তা সত্ত্বেও এদেশের প্রায় চারভাগের এক ভাগ মানুষের জীবন খুবই কঠিন: তারা চরম দরিদ্র। তাদের অধিকাংশের জমিজমা বা ঘরবাড়ি নেই। নেই নিয়মিত আয়ের উৎস।[৩৭] তবে তাদের দুটো হাত আছে, যা দিয়ে তারা জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখে। তাই নিচের তালিকা গত বিশ

[৩৬] রহমান, আ.; আগামীদিনের বাংলাদেশ: একুশ শতকের উন্নয়ন ভাবনা; পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৬৯-৭১।

[৩৭] Toufique, K.A. and C. Turton, op. cit.

বছরে দেশের মানব দারিদ্র্যের ক্রমহ্রাসমান ধারাকে নির্দেশ করে ।

তালিকা ২: মানব দারিদ্র্যের ধারা

চলক	১৯৮১-৮৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৫-৯৭	১৯৯৮-০০
দীর্ঘায়ুর ক্ষেত্রে বঞ্চনা (P_1)	২৮.০	২০.০	১৮.০	১৬.৮
জ্ঞান অর্জনে বঞ্চনা (P_2)	৬২.৬	৪৬.৪	৪২.৭	৩০.৮
অর্থনৈতিক সংস্থানে বঞ্চনা (P_3)	৭৫.১	৫৯.৩	৫০.৯	৪৫.২
মানব দারিদ্র্য সূচক (HPI)*	৬১.৩	৪৭.২	৪১.৬	৩৪.৮

* HPI কে নির্ণয় করা হয়েছে নিচের সূত্রের ভিত্তিতে:

$$HPI=[1/3\ (P_1^3+P_2^3+P_3^3)]^{1/3}$$

সূত্র: বিআইডিএস (২০০১)[৩৮]

তালিকা ৩: মানব উন্নয়নে উন্নতির ধারা

সন	মানব উন্নয়ন সূচক
১৯৬০	০.১৬৬
১৯৭০	০.১৯৯
১৯৮০	০.২৩৪
১৯৯২	০.৩০৯
১৯৯৪	০.৩৬৮
১৯৯৫/৯৭	০.৪২৬
১৯৯৮/৯৯	০.৪৮৫

সূত্র: বিআইডিএস (২০০১)[৩৯]

ওপরের তালিকা থেকে এটা পরিষ্কার যে বাংলাদেশের মানুষের দারিদ্র বহুমাত্রিক, জটিল ও গভীর হলেও তা উত্তরণশীল । তবে মাত্র গুটিকয়েক সূচকের উন্নতি দেখেই আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনো কারণ নেই । সম্প্রতি আইন শৃংখলার চরম অবনতির পাশাপাশি বিশেষভাবে দুর্বল ও দরিদ্রজনদের নিরাপত্তাহীনতা প্রকট হয়েছে, বেকারত্ব বেড়ে যাবার কারণে সমাজে সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা বাড়ছে, শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের অনুপস্থিতিতে গণ সেবার গুণগত মান নিম্নমুখী হচ্ছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েই চলেছে, উন্নয়ন সংগঠন ও সরকারের কাজ কর্মে সমন্বয় না থাকায় অর্থের অপচয় হচ্ছে, সরকারি উন্নয়ন কাজে সীমাহীন দুর্নীতি বেড়েই চলেছে । এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রচলিত মানব উন্নয়ন সূচকের উন্নতিকে খাটো করে দেখার উপায় নেই । বরং সাংগঠনিক সক্রিয়তা আরো বাড়াতে পারলে সামাজিক পুঁজির প্রসার ঘটবে । আর তা করতে পারলে মানবিক পুঁজি, এমন কি বৈষয়িক পুঁজির

[৩৮] Fighting Human Poverty: Bangladesh Human Development Report 2000, BIDS, Dhaka, p. 31.

[৩৯] ঐ, p. 29.

ভিত্তি প্রসারিত হবে।

এ বাস্তবতায় দেশের জনগণ, তাদের সংগঠন ও সরকার যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সুযোগ, অংশগ্রহণ, সুশাসন, সামাজিক ও লৈঙ্গিক বৈষম্য হ্রাস, গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, ন্যায় বিচার ও মানবাধিকারের মত আর্থ-সামাজিক চলকগুলোর মান বাড়বে। গণ-দারিদ্র্যের বোঝা হালকা হবে। উন্নয়ন হয়ে উঠবে মানবিক। এ জন্য চাই সমাজের সকলের সহযোগিতা ও দৃঢ় ঐক্য।

৪. *বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিবেশ : সংকট ও উত্তরণের উপায়*

আমরা দিন দিন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছি। তবে যতটা সচেতন হচ্ছি, প্রকৃতির প্রতি সদয় হচ্ছি তার চেয়ে ঢের কম। নিত্যকার ভোগ ও বিনিয়োগের বিনিময়ে চরম ক্ষতি করছি পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার, বাজার অর্থনীতির দাম ব্যবস্থা প্রকৃতির যে পরিমাণ ক্ষতি করছে তার ক্ষতিপূরণ করছে না কেউ। পৃথিবীর দাপটশীল বাজারপন্থী অর্থনীতিগুলো সুনির্দিষ্ট কোনো ঐকমত্য ছাড়াই এবারের ধরিত্রী সম্মেলন সমাপ্ত করে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে পরিবেশ প্রশ্নে তারা দশ বছর আগে রিওতে যে প্রতিশ্রুতিগুলো করেছিল তা ছিল নিছক ভন্ডামী। ফলে গত দশ বছরে তারা আরো পশ্চাৎমুখী, আরো রূঢ় হয়ে উঠেছে পরিবেশের প্রতি। এর প্রতিকূল প্রভাব তাদের নিজেদের পাশাপাশি, বিশেষ করে, বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর ওপর প্রকটভাবে পড়ছে। ইতোমধ্যে আমাদের ওপর প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। তবে আশার কথা এই, আমরা সচেতন যেমন হচ্ছি, কাজও করছি। পলিথিন বন্ধ করেছি সবাই মিলে। দুইস্ট্রোক ইনজিনের পরিবহণ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে। কিন্তু বকেয়ার তালিকা এখনও অনেক বড়ো। এখনও নগরীর বায়ু বিষাক্ত। বুড়িগঙ্গার পানি বিষাক্ত। চট্টগ্রামের পাহাড় কাটা পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। নদী দখল, লেক দখল হরহামেশাই হচ্ছে।

পরিবেশের কোনো ক্ষতি হলে প্রথমেই তার শিকার হয় সাধারণ মানুষ। কেননা তারা সাধারণত কম সচেতন থাকে। তাই পরিবেশ রক্ষার সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ (people's participation) সবচেয়ে জরুরি। সেইসঙ্গে দরকার নাগরিক সংগঠনগুলোর জনগণের কাতারে নেমে আসা। একসাথে কাজ করা। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হলে এই অংশগ্রহণ আরো শক্ত ভিত্তি পায়। কার্যকর নাগরিক অংশগ্রহণ এমনিতেই হয় না। এর জন্য দরকার উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সুচিন্তিত সরকারি হস্তক্ষেপ। অবশ্য স্থানীয় জনগণ নিজেরাই তাদের পরিবেশের প্রতি দরদী হলে ঐ সম্প্রদায়ের পরিবেশগত উন্নয়ন আরো ভালো হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই নাগরিক পদক্ষেপ পরিবেশের উন্নতিতে এত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ রক্ষায় অনেক দেশের নাগরিক সংগঠনগুলো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমাদের দেশেও ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের নানা স্থানে স্বত:স্ফূর্তভাবে নাগরিক সমাজের পরিবেশ সংরক্ষণের বেশ কিছু উদ্যোগ হালে লক্ষ্য করা গেছে।

নাগরিক পদক্ষেপের পক্ষে কতগুলো মৌলিক যুক্তি আছে।

- প্রায়শ:ই নাগরিক অংশগ্রহণের সুবিধা না নিয়ে পরিবেশগত সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়। এতে জনসম্প্রদায়ের অনিষ্ট হয়।
- সিদ্ধান্ত নেবার জন্য নাগরিকেরা যখন আলোচনার টেবিলে বসেন, তখন সিদ্ধান্তগুলো আরো পোক্ত হয়।
- যে এজেন্সিগুলোকে কোনো সম্প্রদায়ের পরিবেশের দেখভাল করার দায়িত্ব দেয়া হয় তাদের

চেয়ে সেখানকার মানুষেরাই তাদের পরিবেশ সম্পর্কে ভালো জানেন।

- অনেক এলাকায় জনগণ স্থানীয় পরিবেশ রক্ষায় তাদের প্রতিবেশিদের সাহায্য করে থাকে। সাহায্য নিয়েও থাকে।
- জনগণের বেঁচে থাকার জন্য এমন উপায় জানা দরকার যার মধ্যে দিয়ে তারা যুগের পর যুগ টিকে থাকতে পারে।

বিভিন্ন উপায়ে সাধারণ মানুষ পরিবেশের সংগে জড়িয়ে আছেন:

- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে
- উন্নয়ন উদ্যোগের শিকার তারাই
- তারাই প্রকৃতিকে লালন পালন করেন
- প্রতিবেশ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ও সংকটের মোকাবিলা করেন তারাই[৪০]

বিভিন্নভাবে, নানা মহল থেকে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে ফেলা হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক পরিবেশ সংকটের প্রতিকুল প্রভাব। আমরা আমাদের সোনাফলা কৃষি জমির উর্বরতা ধ্বংস করছি রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগে বাড়াবাড়ি করে, যা আবার মৎস্য সম্পদ উজাড় করতেও ইন্ধন যোগাচ্ছে। নির্বিচারে গাছ কেটে শ্যামল ভূমিকে মরু করেছি, পাহাড় কেটে ভূমিবৈচিত্র্য ধ্বংস করেছি। জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্যও নষ্ট করেছি। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও অন্যান্য উপায়ে ফি-বছর এক শতাংশ করে ধানী জমি গ্রাস করেছি।[৪১] শিল্প ও নগরীর বর্জ্যে জলাশয় দূষিত করছি, দখল করছি নদী, লেক। বায়ু ও শব্দ দুষণ করছি নির্বিচারে।

তবে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা আংশিকভাবে পূরণ করা গেলেও পরিবেশ রক্ষায় আমাদের এখনই উদ্যোগ নেয়া উচিত। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবেশের প্রতি যে কোন ধরণের অবিচারের চেষ্টা প্রতিহত করতে হবে। এজন্য আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে কতগুলো জরুরি কাজ করতে হবে।

- পরিবেশ সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এজন্য শুধু কিছু পরিবেশবাদী সংগঠন নয় বরং দারিদ্র্য, লৈঙ্গিক বৈষম্য বা অন্যান্য সামাজিক সমস্যা নিয়ে যেসব সংগঠন এদেশে কাজ করে তাদের প্রত্যেককেই এ কর্মকান্ডে অংশ নিতে হবে।
- তরুণদেরকে পরিবেশ রক্ষার কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে, শহরে, গ্রামে তরুণদেরকে পরিবেশ ক্লাব গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য স্বত:স্ফুর্তভাবে তরুণরা পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মকান্ডে যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখাচ্ছে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে প্রবাহিত করতে পারলে তা নিশ্চয় টেকসই হবে। তরুণদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার এই আগ্রহকে

[৪০] *People's Report on Bangladesh Environment 2001*, A. Rahman et al (ed.), vol. 1, UPL and Unnayan Shamannay, Dhaka, 2001, p. 5.

[৪১] *Ecofile*, ed. by A. Rahman, Unnayan Shamannay, Dhaka, Oct.-Dec. 2001, p. 30 (interview of M.A. Sattar Mondal).

[৪২] পরিবেশপত্র; আতিউর রহমান সম্পাদিত, উন্নয়ন সমন্বয়, ঢাকা, এপ্রিল-জুন ২০০২, পৃ.৪ (সম্পাদকের পাতা)।

আমাদের যে কোনো মূল্যে ধরে রাখতে হবে।[৪২]

- পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে লোকজ জ্ঞানের সমাবেশ ঘটাতে হবে। দেশের প্রত্যেক এলাকায় স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিদের অর্জিত জ্ঞান পরিবেশ রক্ষার ব্যবহারের জন্য তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। তাদের সংগে আধুনিক জ্ঞানের বিনিময় করতে হবে।
- গণমাধ্যমগুলোকে পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের একেকটি ভান্ডার হতে হবে।
- পরিবেশ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সরকারকে নাগরিকদের সংগে আলোচনার টেবিলে বসতে হবে। স্থানীয় জনগণকে এই আলোচনায় আনতে হবে।
- পরিবেশ সহায়ক বাজেট তৈরি করতে হবে। তবে এজন্যও চাই নাগরিক সংলাপ। অঙ্গীকার।
- কৃষকদেরকে পরিবেশ বান্ধব কৃষি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক জ্ঞান দিতে হবে যাতে তারা তাদের লৌকিক জ্ঞানের সমন্বয়ে আমাদের উর্বর ভূমি ও কৃষিকে টেকসই (sustainable) করে তুলতে পারে।
- পাহাড়কাটা, জলাশয় দখল ও দূষণ, ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো প্রভৃতির বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
- বৃক্ষরোপনকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র মরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই নির্মূল করেছে। বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।

আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে।

— 'অরণ্যদেবতা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, পৃ. ৩৭৩

বিধাতার কল্যাণের দানকে আমরা নষ্ট করেছি। পরিবেশের প্রতি অবিচার করেছি। নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে এনেছি। তাই এখনই আত্মোপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়ে সবাই মিলে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। যথার্থ আচরণ করতে হবে তার সংগে। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই পরিবেশ সহায়ক উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করতে হবে।

৫. উপসংহার

উন্নয়নকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী যে ত্রিসংকট দেখা দিয়েছে তার ছোঁয়া বাংলাদেশেও লেগেছে। এই সংকটের পরিণতি হিসেবেই আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে ভরসার সংকট দানা বাঁধছে।

শুধুমাত্র বৈষয়িক পুঁজি নির্ভর একচোখা উন্নয়ন করতে গিয়ে আমরা মানব ও সামাজিক পুঁজিকে বড়ই

হেনস্তা করেছি। সমাজের ভেতরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবেই যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিরাজ করছিল তা আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ভেঙ্গে ফেলছি। বৈষয়িক ও মানব পুঁজি চোখে দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক পুঁজি প্রায়ই অদৃশ্য থাকে। সম্পর্ক অনুভব করা যায়। দেখা যায় না। ব্যক্তির স্বার্থ খানিকটা পরিত্যাগ করে হলেও সমাজের অন্য দশজনের কল্যাণের ভিত্তি প্রসারিত করার অপর নাম সামাজিক পুঁজি। প্রত্যেক মানুষ শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় এ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে সামাজিক পুঁজির ধারণা। যে সমাজে মানুষ স্বেচ্ছায় তথ্য দিতে আগ্রহী, অন্যের উপকারে আসে এমন কাজে উৎসাহী মানুষের সংখ্যা বিপুল, সেই সমাজে অন্য দু'ধরনের পুঁজির কমতি থাকলেও সামাজিক পুঁজির কল্যাণে নানা ধরনের গণ-উদ্যোগ নেয়া সম্ভব। মূলত: স্বেচ্ছায় সমাজের কাজ করার দৃষ্টিকোণ থেকে এই পুঁজির সন্ধান করতে হবে। যান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেই এর প্রসার ঘটবে না। মানুষে মানুষে সম্পর্কায়নের বিষয়টি সামাজিক পুঁজির ধারণায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সমাজ তার সদস্যদের ওপর জোর খাটিয়েও যৌথ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সেই সমাজে সামাজিক পুঁজির বিকাশ ঘটেনা। আসলে প্রয়োজন কার্যকরী মানবিক সম্পর্কায়ন বা বোঝাপড়া। সমঝোতা। উন্নত বিশ্ব সব সময় বড় কিছুর পক্ষে। আর সামাজিক পুঁজির ব্যবহার সর্বোচ্চ হতে পরে ছোট ছোট উদ্যোগের চৌহদ্দিতে। তবে বড় উদ্যোগেও সামাজিক পুঁজির প্রসার ঘটানো সম্ভব। তবে তার পেছনে নাগরিক সমাজের নানা গ্রুপ, সংগঠনের সক্রিয়তার মাত্রাও বেশি বেশি হতে হবে। যে রাষ্ট্রের এমন সংগঠন, গোষ্ঠী তথা নাগরিক সমাজের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তার পক্ষে উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা মোটেই সহজ নয়। সেজন্যেই নাগরিক সচেতনতা সক্রিয়তার প্রসঙ্গটি এতোটা গুরুত্বপূর্ণ। আইন করে, চুক্তি করে এই নাগরিক বোঝাপড়া সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় গড়ে ওঠা সংগঠনগুলো সক্রিয় হয়ে যদি নাগরিকদের মাঝে দেশপ্রেম বা এমন তরো ইতিবাচক সচেতনতা গড়ে তোলে তাহলে সমাজের উন্নয়নের জন্যে যৌথ সিদ্ধান্ত নেয়া শুধু যে সহজই হবে তাই নয়, এসব সিদ্ধান্ত টেকসইও হবে। আর তখন মানব উন্নয়নের পথ সুগম হবে। একই সঙ্গে তখন বর্তমান প্রজন্মকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে ত্যাগ স্বীকারেও উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হবে। আমাদের পূব দেশীয় সমাজের পরিবার, পড়শি, আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে কিছু করার এই প্রবণতাকে উন্নয়নের কাজে লাগাতে চাইলে বহুমাত্রিক সংস্কৃতির শক্তিকেও হিসেবে নিতে হবে। জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে আমাদের সম্মিলিত ভাবে দুঃখ ভাগ করে নেবার অভিজ্ঞতা এবং গৌরব বোধ করার মতো ঐতিহ্যকে (ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ) দেশ গড়ার উপকরণ করতে পারলে সমাজে, অর্থনীতিতে সৃজনশীলতার স্ফুরণ ঘটবেই। আমাদের মতো সমাজের জন্য আমাদের স্থানীয় বুদ্ধিমত্তা, প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এবং জনগণের পছন্দের কথা মনে রেখে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করতে পারলে জাতি হিসেবে আমাদের ইতিবাচক উত্তরণ না ঘটে পারে না। সেজন্যে প্রচুর সামাজিক নিরীক্ষার প্রয়োজন। বাংলাদেশ এদিক থেকে সৌভাগ্যবানই বলা চলে। নানামুখী উন্নয়ন নিরীক্ষা করে দেশটিকে আমরা এরই মধ্যে একটি সামাজিক ল্যাবরেটরি করে ফেলেছি। এখন আসলে এসব পরীক্ষা নিরীক্ষার নির্যাস নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার পালা। সেজন্যে চাই উপযুক্ত নেতৃত্ব। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব। বৈচিত্রপূর্ণ্য এই সমাজের জন্যে আমাদের সক্ষমতার নিরিখে চাই স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে বহুমাত্রিক সমাধান। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া বা ধার করা সমাধান আমাদের গণচাহিদা পূরণ করতে পারবে না। সে কারণেই চাই স্ব-উন্নয়ন। মোটা দাগে সামাজিক পুঁজি-নির্ভর দেশজ সেই উন্নয়ন কৌশলের কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যেতে পারে।

- সমাজের হৃদয়ের যে নিরন্তর ভাঙন চলছে তা ঠেকাতে হবে যেকোনো মূল্যে। এজন্য দেশের

ভেতর কার্যকর বিভিন্ন সংগঠন, পেশাজীবী গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি সকলকে একত্রিত হতে হবে এবং যারা এই ভাঙনের জন্যে দায়ী তাদের ওপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের ছাড়া ছাড়া এই ভাব ত্যাগ করতে হবে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আলোচনার টেবিলে বসতে হবে। প্রধান দুই নেত্রীকে সরাসরি কথা বলতে উৎসাহী করতে হবে। কথায় কথায় মুখোমুখি অবস্থান ত্যাগ করতে হবে। দুর্বলের ওপর সবলের আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। যারা বর্তমানে দেশ পরিচালনা করছেন বা ভবিষ্যতে করবেন তাদেরকে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ ও উন্নয়নের স্বার্থেই মৌলিক কিছু জাতীয় প্রশ্নে এক হতে হবে। সেই ইস্যুগুলো নিয়ে জনগণের সংগে সংলাপে বলতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সরকারকেই আগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সর্বত্র দলীয়করণ এবং প্রতিহিংসার মনোভাবে ত্যাগ করতে হবে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের চাপে সমাজের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। এ অবস্থার অবসানে চাই সার্বিক ঐকমত্য এবং মাইন্ডসেটের পরিবর্তন।

- শিক্ষাকে কার্যকর হতে হবে যাতে তা সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শের বাহন হয়ে উঠতে পারে। বিবেকবান মানুষ তৈরির নৈতিক অনুপ্রেরণা শিক্ষা থেকেই আসতে হবে। দেশপ্রেম যেন শিক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। সমাজকে মানবিক করার জন্যে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। খোলা মনে বিশ্বকে দেখার চোখ শুধু শিক্ষাই তৈরি করতে পারে। ইতিহাসের সবরকম বিকৃতি ও সুবিধাবাদ যেন পাঠ্যসূচিতে আশ্রয় না পায়। আমাদের এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চাই যাতে তা সামাজিক ন্যায়বিচার ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। ব্যক্তি নিজেকে ও সমাজকে প্রশ্ন করতে শেখে। সকলে মিলে আত্মনির্ভর জাতি গঠনে উদ্যোগী হয়। আমাদের দেশ আমরাই আমাদের মতো গড়বো — এই মনোভাব তৈরিতে শিক্ষাকে এগিয়ে আসতে হবে।

- এনজিও আন্দোলন বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এটা সামাজিক পুঁজির জন্য খুবই ক্ষতিকর। এ বিভক্তি রোধ করতে হবে সমাজের সকলের প্রয়োজনেই। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবে উন্নয়ন সংগঠনগুলোকে সর্বদাই স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সার্বভৌম ও শক্তিশালী করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জন অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে হবে। তাদের জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সংগী করতে হবে। স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণকে সাথে নিতে হবে, তাদের সাথে আলাপ করতে হবে। স্থানীয় উন্নয়ন ও সামাজিক সংগঠনকেও তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হবে।

- জনগণের প্রযুক্তিপ্রীতি বাড়াতে হবে। আমরা খুব বেশিদূর এগুতে পারবো না যদি সমাজের সকলের মধ্যে প্রযুক্তি ছড়িয়ে না দিই। এখনও দেশের নব্বইভাগ মানুষ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে বিযুক্ত। মাত্র ২০ভাগ মানুষের ঘরে বিজলি বাতি জ্বলে। ভারতের অনেক রাজ্যেই গ্রাম পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। জ্ঞান নির্ভর বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান ভালো করতে চাইলে তথ্য ও জীব প্রযুক্তির প্রসার দ্রুতই করতে হবে। শিক্ষা ও টেলিযোগাযোগ খাতকে সেই লক্ষ্যে ঢেলে সাজাতে হবে।

- চীন এবং পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে ঐ সব দেশের প্রবাসী নাগরিকদের পুঁজি, বুদ্ধি ও যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের দেশের বিদেশী মুদ্রা ভান্ডার মজবুত করার ক্ষেত্রে প্রবাসীদের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। তাছাড়া, প্রবাসে আমাদের একটি

নবীন প্রজন্ম তৈরি হয়েছে যারা দেশের জন্যে কিছু একটা করতে চায়। শিল্প, ব্যবসায়, সংস্কৃতি, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রেই তাদের আধুনিক চিন্তা, দক্ষতাকে কাজে লাগানো সম্ভব। সেজন্যে দেশের ভেতরে সামাজিক শান্তি এবং উৎসাহব্যঞ্জক সরকারি নীতিগত সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে।

- উন্নয়নকে প্রতিবেশের চোখে দিয়ে দেখতে হবে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সকল উপাদান যে পরস্পরসংযুক্ত সেকথা উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণের সময় মনে রাখতে হবে। মানুষের উন্নয়ন করতে গিয়ে যেন আমরা প্রতিবেশের অন্যান্য উপাদানের ক্ষতি না করি। সেজন্যে চাই সমন্বিত উন্নয়ন। চাই আগামী দিনের প্রজন্মের হিস্যানুকুল উন্নয়ন।

- রাষ্ট্রকে চালকের ভূমিকা ত্যাগ করে নির্দেশক হতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। তারাই একে চালনা করবেন। রাষ্ট্র শুধু দিক নির্দেশনা দেবে। ব্যক্তিখাত, লাভজনক খাত এবং রাষ্ট্রীয় খাতকে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাবার পরিবেশ রাষ্ট্রকেই তৈরি করে দিতে হবে। সকলকেই 'রুলস্ অব গেম' মেনে চলতে হবে।

- ব্যক্তি ও সমাজের সিদ্ধান্তের মধ্যে সুসমন্বয় ঘটাতে হবে। ব্যক্তি যেন তার ঘরকে স্বপ্নের সমান উচুঁ করতে গিয়ে জনগণের আকাশ ঢেকে না ফেলে। লেকের পাড়ে সুন্দর বাড়ি গড়লাম। কিন্তু ঢাকার বাতাস বিষাক্ত। ঐ সুন্দর ঘরেও আমার সন্তানেরা তখন আর নিরাপদ নয়। তাই ঘরে বাইরে নিরাপদ জীবন চাই। ব্যক্তি আর সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতা চাই।

- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মতো সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে হবে। এজন্য প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের উদ্যোগ ও নাগরিক চাপ প্রয়োগের বিকল্প নেই। এই ক্ষেত্রেই সামাজিক পুঁজির সর্বোচ্চ বিনিয়োগ চাই।

- রাজনীতিতে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। রাজনীতি যাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে জনগণের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যম, গণ সংগঠন, শিক্ষা, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্র থেকেই রাজনীতির দূর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে।

- উন্নয়নের মূলধারায় দেশের ব্যাপক নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণ। বিশ্বায়নের প্রতিকূল প্রভাব থেকে দেশের কর্মজীবী নারীসহ সমাজের দুর্বল অংশকে রক্ষা করতে হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের নারী সমাজ স্ব-উদ্যোগে যথেষ্ট সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সমাজকে তাদের এই অবদান স্বীকার করতে হবে। তাদের জন্যে আরো গণতান্ত্রিক space করে দিতে হবে।

- নারী, শিশু, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর সকল রকম অনাচার ও বৈষম্য দূর করতে হবে। তাদের কারণেই যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্রপূর্ণ বাংলাদেশ পেয়েছি তাকে আরো সহনশীল ও সমৃদ্ধ করতে হবে।

- এ দেশের জনগণ তাদের সৃজনশীলতার গুণে দ্রততম সময়ে স্বাধীনতভাবে বেঁচে থাকার পথ সৃষ্টি করেছে। তাদের সেই সৃজনশীলতাকে দারিদ্র্য নিরসন ও স্ব-উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। দশে মিলে সেই উন্নয়ন প্রয়াসে অগ্রসর হলে জাতি নিশ্চয় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। কৃষি, বস্ত্র, নারীর

ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা সৃজনশীলতার পরিচয় রেখেছে। তাদের এই অগ্রযাত্রার গতি অব্যাহত রাখার জন্যে যা যা দরকার তাই আমাদের করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে শেষ করতে চাই। সমবায়নীতিতে তিনি বলেছিলেন:

মানুষ খাটো হয় কোথায়। যেখানে সে দশ জনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা- মানুষ টুকরা মাত্র। এটা তো দেখা গেছে, ছেলেবেলায় একলা পড়িলে ভুতের ভয় হইত। বস্তুত এই ভূতের ভয়টা একলা-মানুষের নিজের দুর্বলতাকেই ভয়। আমাদের বারো-আনা ভয়ই এই ভূতের ভয়। সেটার গোড়ার কথাই এই যে, আমরা মিলি নাই, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া আছি। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, দারিদ্র্যের ভয়টাও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি। বিদ্যা হলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মানুষের যা-কিছু দামি এবং বড়ো, তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে। বালি-জমিতে ফসল হয় না, কেননা, তাহা আট বাধে না, তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি পাতা-পচা প্রভৃতি এমন-কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আটো হয়। মানুষেরও ঠিক তাই, তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয়।

'সমবায়নীতি', রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ. ৩১৩

তাই আমাদের সকলকে যে কোনো মূল্যে এক হতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সামাজিক পুঁজি বিনিয়োগ করে মানব উন্নয়ন দ্রুততর করতে হবে। দরিদ্র্য নামের ভূতটিকে তাড়াতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য দিতে হবে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করতে হবে। সকলে মিলে সমাজকে দারিদ্র্য নামের ভূতের ভয় থেকে মুক্তি দিতে হবে। পরিবেশকে আপন জীবনের অংশ ভাবতে হবে। তার প্রতি সকল অবিচার বন্ধ করতে হবে। একুশ শতকে সবাই মিলে আলোকিত উন্নয়ন পথে এগিয়ে যাবো এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।